রুশতী সেন : সমালোচনার এক প্রাজ্ঞ অভিমুখ

শ্রাবণী পাল

> ১৯৭৬ কলেজে ভর্তি হওয়ারও আগে, আমার একটি লেখা অনুক্ত পত্রিকায় বেরোয়— 'অপুর জয়-পরাজয়'। সহৃদয় সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুনীলকুমার নন্দী আনকোরা নতুন লিখিয়েকে উৎসাহ দিতে লেখাটি নিয়ে খুব ধন্যি-ধন্যি করেছিলেন।... কিন্তু আসলে তো সেটা নবম-দশম শ্রেণিতে পড়বার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে দু-কিস্তিতে লেখা একটা বালখিল্য প্রবন্ধের সামান্য পরিমার্জিত সংস্করণ। (রুশতী সেন, 'অনুসন্ধানের গল্প', গবেষণার অন্দর-বাহির, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ২০১০, পৃ. ১৩)

রুশতী সেন (জন্ম ১৯৫৯)-এর এই বয়ান থেকে যে-কয়েকটি সূত্র পাওয়া গেল তা' এইরকম—প্রথমত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ নবম-দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই প্রকাশ পেয়েছে; দ্বিতীয়ত, স্কুল ম্যাগাজিনের লেখালিখি থেকে ধরলে তাঁর লেখনী সচল প্রায় পঞ্চাশ বছর এবং তৃতীয়ত, কৈশোরক সেই লেখা সম্পাদকের যে প্রশংসা পেয়েছিল, এখনও তার প্রবহমানতায় ছেদ পড়েনি। অর্থাৎ 'একে তো অর্থনীতিতে পরীক্ষা পাস করে বাংলাসাহিত্য নিয়ে হিজিবিজি লেখে'—এই বিনয়াবৃত কৌতুকে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই রুশতীর লেখালিখির সূচনা।

বাসন্তী দেবী কলেজে অর্থনীতির শিক্ষক রুশতী, বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচক। কিংবা এমনভাবেও বিন্যস্ত করা যায় বাক্যটিকে—বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সমালোচক রুশতী, বাসন্তী দেবী কলেজে অর্থনীতির শিক্ষক। বাক্যের এই চলনটাই বরং তাঁর লেখালিখির স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে দেয়—কেননা অর্থনীতি-সমাজতত্ত্ব-রাজনীতির একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে বাংলা সাহিত্য পাঠের প্রতিক্রিয়া, সাহিত্যবোধ ও রসানুভবের পাশাপাশি অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে সমাজকে অনুধাবন ও সেই প্রেক্ষিতে সাহিত্যের এমন মননশীল বিশ্লেষণ, বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ধারায় ব্যতিক্রমী উচ্চারণ। এর উৎস রয়ে গেছে তাঁর পারিবারিক ঘরানায়—অশোক সেনের সঙ্গে কথালাপে এবং পরে স্নাতক স্তরে নবেন্দু সেনের পাঠদানে। এবিষয়ে রুশতী সেন নিজেই বলেছেন—

> প্রেসিডেন্সি কলেজে সাম্মানিক অর্থনীতির ক্লাসে প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়াতেন নবেন্দু সেন।... বিশিল্পায়ন থেকে কৃষির

> বাণিজ্যীকরণ, রেলপথ নির্মাণ বনাম চাষকাজ আর সাধারণের জীবনযাত্রার সমূহ ক্ষতি, ড্রেন থিওরি, ... এইসব পড়াতে পড়াতে একটা কথা মনে গেঁথে দিতেন নবেন্দুবাবু—ইংরেজের ভারত কী নিদারুণ জটিলতা স্ববিরোধে দীর্ণ! ভারতের অর্থনীতির ইতিহাস উপনিবেশ থেকে স্বাধীন দেশে পৌঁছতে-পৌঁছতে, সে-স্ববিরোধ কেবল রং বদলেছে, ভোল পাল্টেছে। এই স্ববিরোধের স্বরূপকে যদি বুঝতে হয় তবে অর্থনীতি থেকে সমাজ থেকে সংসার পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। যেতে হবে রাষ্ট্রের কাছে, পাশাপাশি সংস্কৃতির কাছে, আখ্যানের কাছে।

... নবেন্দু সেনের ক্লাসের অনেক বোঝা-না-বোঝা নিয়ে জানা-অজানা বিষয়ে বাড়িতে কথা হত বাবার সঙ্গে।... অর্থনীতি-সাম্মানিক অথবা স্নাতকোত্তর স্তর মিলিয়ে এই একটিমাত্র বিষয়ই বাবা নিজে খানিকটা পড়িয়েছিলেন আমাকে।...

একটা সুবিধা অথবা অসুবিধা আমার পড়তে শেখার পরিবেশে সবসময় ছিল। ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতি, অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের যে চত্বরেই ঘোরাফেরা করি, তাকে পড়তে হবে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে, সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্দরেও খুঁজে নিতে হবে সমাজবিজ্ঞানের উপাদান। পড়াশোনার এই ধরনটাই যে পড়বার একমাত্র ধরন, এরকম একটা ধারণার প্রলেপ আমার ঘরের চারপাশে খুব বেশি।... ওই ধারণার চর্চাটা প্রায় সর্বক্ষণের সরবতায়, নীরবতায়, লেখাপড়ায়, আড্ডায়, গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ায়, নাটক কিংবা চলচ্চিত্র দেখায়, গান শোনায়।

আর—নবেন্দুবাবুর ক্লাসে, বাবার সঙ্গে আলোচনায়, বিষ্ণু দে-র 'পরবাসী'র মতো কবিতায় ভারতের সমাজ অর্থনীতির যাত্রাপথে নিহিত যে-স্ববিরোধকে দেখেছি, সেই স্ববিরোধের, সেই পরবাস-যন্ত্রণার অংশ হিসেবে কি আপাতসরল, স্ব-গ্রামনিষ্ঠ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণকেও পড়া যায়? এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বেশি ছিল আমার বিভূতিভূষণ চর্চার আড়ালে। ('অনুসন্ধানের গল্প', পূর্বোক্ত পৃ. ১৬-১৭) এই উৎস থেকে এগোনো যায় তাঁর বিভূতিভূষণ চর্চার অভিমুখে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯), বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস (প্যাপিরাস, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৮), সত্যজিতের বিভূতিভূষণ (প্যাপিরাস, ২০০৬), Bibhutibhushan Reader (Sahitya Akademi, 2016) এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানে (অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪)।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অনুরোধে যখন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনীরচনায় হাত দিলেন রুশতী, তখনই বিভূতিভূষণকে নিয়ে তাঁর দুটি বই বেরিয়ে গেছে—বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস (১৯৯৩) এবং সত্যজিতের বিভূতিভূষণ (১৯৯৪)। আবাল্য বিভূতিভূষণে নিষ্ণাত রুশতী সেন জীবনীগ্রন্থের প্রচল আঙ্গিককে প্রত্যাখ্যান করলেন অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের বন্ধুর পথ পেরিয়ে—

> যে জীবনীটি শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পেরেছিলাম, তার বিন্যাসের ক্রম ছিল উল্টো— মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪)

মনের মধ্যে তখন নানা প্রশ্নের আবর্ত—শুধুমাত্র ১৮৯৪, জন্মের সাল-ই কি একজন

লেখকের জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন? না কি ১৯২৯—যখন প্রকাশিত হল 'পথের পাঁচালী' অথবা ১৯৩০-এর পর থেকে বিভূতিভূষণের জীবনের ঘর আর বাইরের নানা কথা? এইসব ভাবনার মধ্যেই

> হঠাৎ মনে এল—বাল্যকালে দেখা একটি তথ্যচিত্রের প্রথম দৃশ্য—লোকে লোকারণ্য পথ, একটি শববাহী গাড়ি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শবযাত্রা। চোখের সামনে দর্শক দেখতে পান জনস্রোত আর শুনতে পাব অসামান্য কণ্ঠের ভাষ্যপাঠ—On 7th of August 1941 in the city of Calcutta a man died....। এইভাবেই সত্যজিৎ রায় শুরু করেছিলেন তাঁর তথ্যচিত্র Rabindranath Tagore।... অসীম স্পর্ধায় ঠিক করে ফেললাম, জীবনীর প্রথম অধ্যায়ের নাম হবে 'পয়লা নভেম্বর, ১৯৫০'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন। তারপর আরও তিনটি অধ্যায় '১৯৪১-৫০', '১৯৩১-৪০' আর '১৮৯৪-১৯৩০'। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫)

এই ভাবনার জন্যই অনেক জীবনীগ্রন্থমালার মধ্যে রুশতী সেনের 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' আলাদা হয়ে যায়, আলাদা হয়ে যায় তথ্য সংগ্রহে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই তথ্য বিন্যাসে সৃজনশীল শিল্পীর তীব্র স্বানুভব আর সংবেদনায়। বস্তুত, বিভূতিভূষণের কথকতার যে সাবেকি সুরটা জীবনীকারকে ছোটবেলা থেকেই টানত, 'সে-সুর আসলে ঘরের আর বাইরের, জীবন আর জীবিকার, আচরণ আর বিশ্বাসের নির্মম, নির্বিকল্প স্ববিরোধকে মূর্ত করবার এক পরম মায়াময় আয়োজন।' কোথাও যেন একটা বেদনা ছিল বিভূতিভূষণের জীবনে, কল্যাণীর জীবনে, সুপ্রভার জীবনে! সেই বেদনাকে অনুভব করেই গবেষণা-সমালোচনার স্তর পেরিয়ে রুশতীও কখন নতুন সৃষ্টির আঙিনায় পৌঁছে যান। সেই সৃষ্টিসম্ভব বেদনার গর্ভেই জন্ম নেয় 'একটি অনিবার্য মৃত্যু' কিংবা 'যারা দুর্গা নয়'-এর (বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস, ১৯৯৩) মতো প্রবন্ধ। সেজন্যই এমন মরমী গদ্যে রুশতী লিখতে পারেন—

> যে ভাইকে দুর্গা বাঁকা কঞ্চি, ছোটা কিংবা পাকা মাকালফল দিয়ে ভরিয়ে রাখত, সেই ভাইদের সাবালক জগৎ সাবালিকা দুর্গার জন্য বঞ্চনার প্রান্তসীমাই কেবল নির্দেশ করবে, একথা জীবন দিয়ে বুঝবার আগেই মরণ দুর্গাকে নিষ্কৃতি দেয়। যে নীরেন পথ হারিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের ঘন বনে দুর্গার সাহায্য চায়, জীবনের পথে সেই নীরেনদের করুণার কিনার ধরেই প্রাকৃতিক দুর্গারা চলবার নিশানা পেতে পারে। চলবার যুক্তি নির্দেশ করবে কখনো অপু, কখনো নীরেন। যদি দুর্গা বেঁচে থাকত, সেই যুক্তিতে দুর্গার প্রাকৃত শক্তি ঝুরে ঝুরে মরত। (একটি অনিবার্য মৃত্যু, পৃ. ১০৭, ১৯৯৮)

তাঁর এই বিভূতি-সন্ধানের আরেকটি ক্ষেত্র সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্র—পথের পাঁচালী অপরাজিত-অপুর সংসার এবং অশনি-সংকেত। এবং লক্ষনীয়, এই তুলনামূলক পাঠে রুশতী চলচ্চিত্রের পরিভাষা ব্যবহার থেকে অনায়াসে নিজেকে দূরে

রাখেন। সত্যজিৎ রায়ের বিভূতিভূষণ-পাঠ এবং তার প্রতিক্রিয়ার ভিতর-নিহিত সত্য সন্ধানই এখানে তাঁর অন্বিষ্ট—

> আমার বিভূতিভূষণ-নির্ভর-সত্যজিৎ পাঠ এবং সত্যজিৎ-নির্ভর-বিভূতিভূষণ পাঠের ভিতর দিয়ে যে পরিশিষ্ট আমি বানাতে পারি, সেখানে সত্যজিৎ বিভূতিভূষণের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম সঠিক নন : আবার বিভূতিভূষণও সত্যজিতের থেকে বিন্দুমাত্র বেঠিক নন। এমন পরিশিষ্ট অভ্রান্ত নাই হতে পারে। তবে তা মিথ্যা নয়। তাই সত্যজিতের ছবিতে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির উপনিবেশ-দীর্ণ জীবন বুঝতে আমি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে সরিয়ে রাখতে চাই না। আবার বিভূতিভূষণের অপুকে বুঝবার তাগিদে সত্যজিতের অপুকে বাতিল করবার কোনো কারণ দেখি না। (সত্যজিতের বিভূতিভূষণ, প্যাপিরাস, ২০০৬, পৃ. ৭১)

অনেকদিন পর বইটি ফিরে পড়তে গিয়ে মনে হল, বিভূতি-উৎসুক এক গবেষক যেন এখানে আরো-এক বিভূতি-মনস্ক ব্যক্তিত্বের বিভূতি-সন্ধানের ভিতরনিহিত স্তরগুলি পরম আন্তরিকতায় উন্মোচন করতে চাইছেন। যদি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের কথা ভাবতেন রুশতী!

ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালার অন্তর্গত আর-একটি জীবনী লিখেছিলেন রুশতী সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের, সাহিত্য অকাদেমি থেকে বেরিয়েছিল ২০১০ সালে। সেখানেও জন্ম থেকে মৃত্যুর ধারাবাহিকতার প্রচলিত ফর্ম মানেননি তিনি। সমাজবিজ্ঞান-অর্থনীতি-সংস্কৃতি-দর্শন-রাষ্ট্রনীতি-ইতিহাস-ভূগোল এবং সাহিত্য-সংগীত— বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনী শুরু হয়েছিল তাঁর বুদ্ধিবাদচর্চার আলোচনায়— এত বিচিত্র বিষয়ে অনায়াস অধিকার ছিল তাঁর, কিন্তু কখনও শেষ কথা বলেননি। জীবনীকার তা-ই সন্ধান করেছেন এক বিকল্প পাঠের, তাই ধূর্জটিপ্রসাদের জীবন ও রচনাকৃতির আলোচনা কিছুটা ভিন্ন পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছে।

রুশতী সেনের লেখালিখির অনেকখানি জুড়ে রয়েছে মেয়েদের কথা, মায়েদের কথা। বাংলা গল্প-উপন্যাসের অনেক নারীচরিত্র, মেয়েদের লেখালেখি কিংবা পুরুষের কলমে নারী, মেয়েদের আত্মকথা বা স্মৃতিকথা-বিষয়ে যখনই তিনি আলোচনা করেছেন, তখন মনে হয়েছে নারীবাদী তত্ত্বের প্রেক্ষিতেও কোথাও ঢাকা পড়ে যায়নি তাঁর আবেগ এবং সংবেদী মন। বিশেষত যেখানে তিনি মেয়েদের হয়ে-ওঠা, পরিপার্শ্বের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে তার লড়াইয়ের কথা বলেন, সে গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের ক্ষেত্রেই হোক্ বা রঙ্গমঞ্চের চরিত্রাভিনেত্রীর জীবন আর অভিনয়ের কথা, কথনের সেই পরিসরে রুশতীর এই মনটি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য কিংবা নাটকের মেয়েদের নিয়ে আলোচনা তো কিছু কম হয়নি, কিন্তু 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মোতির মা কিংবা শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র-বিশ্লেষণে তা অন্য মাত্রা পায় 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না' (এলোমেলো পাঠে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৫) প্রবন্ধটিতে। ফুলশয্যার আগের রাত্রিতে মুদিতচক্ষু কৃতাঞ্জলি কুমুদিনীর গান—'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি'।

ঘুম ভেঙে কুমুর এই গান, প্রণাম ও দীর্ঘনিশ্বাস দেখে মোতির মা-এর মনে হয়েছিল—

> এই তো কালই হবে ফুলশয্যে, কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কত বড়ো বিড়ম্বনা। বড়ঠাকুর এখন পর; আপন হতে অনেক সময় লাগে। একে ছোঁবে কী করে?... একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের,—সে-জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে... এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায়নি,—কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা... নিশ্চিত করে অনুভব করলে... গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে,—...

উপন্যাসের এই অংশকে সামনে রেখে রুশতী সেনের মনে হয়েছে—

> নারীকেন্দ্রিক সমস্যা বলতে আজ, রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে যা বুঝি আমরা, তার একান্ত মূল্যবান উপাদান কি সেদিন মোতির মায়ের এই নীরব ভাবনায় মিশে ছিল না? (পূর্বোক্ত, পৃ. ২১)

শরীর-মনের সম্মান-অসম্মানের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ তখনই ছিলেন সময়ের থেকে এগিয়ে। এইসময়ে মোতির মা-র বিপরীত চরিত্রে শ্যামাসুন্দরীকে রেখে পরবর্তী-গবেষকদের জন্য রুশতী রেখে যান কিছু প্রশ্নের ইশারা—

> শ্যামা কুমুর জায়গা নিতে পারে না বলেই সে মধুসূদনের কাছে আরামের।... শ্যামাকে কাছে টানার মধ্যে যে সহজাত অসম্মান করার চলন মধুসূদনের, তা দিয়ে কুমুকে পাওয়ার কথা ভাবা যায় না। কুমুকে নিয়ে মধুসূদনের পরাজয়ের বোধ সেখানেই। অথচ, শ্যামা যে তার কাছে আসে, সেই আসার অন্তর্নিহিত পুরো অনুভব কিন্তু মধুসূদনের আয়ত্তে নেই। সস্তা আর দামির ফারাক বানাতে আসলে কে বেশি অসহায়—শ্যামাসুন্দরী না মধুসূদন? শ্যামা তো অন্তত মধুসূদনের প্রতি নিজের মুগ্ধতাকে অমূল্য ভাবত। এইভাবে শ্যামাকে নিয়েও তৈরি হতে পারে নারীকেন্দ্রিক পাঠের কোনো বয়ান— (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫)

মেয়েদের নিয়ে কথাবার্তায় রুশতী সেন বারবার একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন—'আড়াল'। কল্যাণী দত্তের রচনাপাঠ এবং সম্পাদনা এবং ব্যক্তি-মানুষটিকে দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে দেখাশোনার সুবাদে রুশতীর মনে হয়েছিল—

> জ্ঞানের সহায়হীন প্রতাপ থেকে নিজের একান্ত সত্যিগুলোর চারপাশে আড়াল বানানো—এ আবর্ত যে সর্বদাই গৌরবের, তা নয়। 'ইংরাজিতে রাজনীতি বাংলায় অন্য সব কিছু'র উপনিবেশে কল্যাণী দত্তের জন্ম। তাঁর জীবনকথা ব্যেপে যতই তাঁর জন্মভূমি 'বাংলায় রাজনীতি ইংরেজিতে অন্য সব কিছু'র স্বাধীন দেশ হয়ে উঠেছে, ততই সম্ভবত বেড়েছে তাঁর অন্তরালের প্রয়োজন। (শিক্ষিত বাঙালি মেয়ে : গতি ও প্রকৃতি', পরানের আলো ভুবনের আঁধার, পত্রলেখা, ২০১১, পৃ. ২৮)

প্রতিমা ঘোষ (নয় বোনের বাড়ি), শানু লাহিড়ী (স্মৃতির কোলাজ), লীলা মজুমদার (আর

কোনোখানে, পাকদণ্ডী), করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (আর-এক সর্বজয়া), সুনন্দা শিকদার (দয়াময়ীর কথা), জয়া মিত্র (হনুমান), ভারতী রায় (একাল সেকাল/পাঁচপ্রজন্মের ইতিকথা) এবং কেতকী দত্ত (নিজের কথায়, টুকরো লেখায়) প্রমুখর স্মৃতিকথা অথবা আত্মস্মৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন রুশতী সেন তাঁর এই গ্রন্থে। 'কিছু মুহূর্ত কিছু আশ্রয়' (এবং মুশায়েরা, ২০১৭) গ্রন্থটিতে যুক্ত হয়েছে আরো কয়েকটি লেখা, যা' মূলত মেয়েদের আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ। আলোচনা করেছেন কাকলি রায়ের 'জীবন জুড়ে গান' বইটি নিয়ে, অনিমা দাশগুপ্তের 'অনেক দিনের অনেক কথা', রেখা চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিরেখার স্মৃতির ঝাঁপি', জ্যোৎস্নাদেবীর 'তরুর শ্বশুরবাড়ি' এবং আরো কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে। উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণা লোধ (প্রান্তিক সমাজ এবং একটি কালো মেয়ে) ও বেবী হালদারের 'আলো আঁধারি' বইয়ের কথা। অসম্পূর্ণ এই তালিকা থেকেও স্পষ্ট যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের কথাকে এখানে রুশতী পড়তে চেয়েছেন। এই পাঠ-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ধরা পড়েছে সমাজের নানা খুঁটিনাটি আর পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তবে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতা কিংবা বংশকৌলীন্য বা শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিন্নতা, যাই হোক-না কেন, সেই উনিশ শতক থেকে শুরু করে একুশ শতক পর্যন্ত যাঁরা আত্মকথা লিখেছেন, রুশতী সেন লক্ষ করেছেন—

> মেয়েদের স্মৃতিকথায় আড়ালের ভূমিকা খুব বেশি। পূর্ববর্তিনীদের কথা যতখানি উজাড় করে বলা যায়, নিজের সাবালক জীবনের সমসময়ের কাহিনির দরজা ততখানি অবারিত থাকে না। (কয়েকটি স্মৃতিকথা, 'পরানের আলো ভুবনের আঁধার, ২০১১, পৃ. ৮২)

তবে সময়ের প্রবহমানতায় এই 'আড়াল' অনেকটাই সরেছে, যেমন, অনিমা দাশগুপ্তের

> অনেক দিনের অনেক কথা-য় যন্ত্রণা, অনটন, নিজের আবেগতাড়িত অপরিণত সিদ্ধান্তের স্বীকারোক্তি বেশ খানিকটা পরিসর পেয়েছে। ভ্রম নিয়ে, আবেগ নিয়ে পাঠককে কোনো ভুল বোঝাবার প্রকল্প নেই।... ছোটো ছোটো জটিলতা থেকে বৃহত্তর স্বপ্নভঙ্গ পর্যন্ত কোনো বিন্যাসেই অনিমার আড়ালসর্বস্বতা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। ('সুর-বেসুরের জীবনযাপন', কিছু মুহূর্ত কিছু আশ্রয়, ২০১৭, পৃ. ৪৯)

এই অবলোকনেই রুশতী সেন বাঙালি সমাজের কোনো কোনো কমিউনিস্ট পরিবারের সীমাবদ্ধতা বেশ সোজাসাপটা বাচনেই চিহ্নিত করে দেন। অংশটি উদ্ধার করা যাক্— প্রাবন্ধিক লিখছেন,

> আদর্শের ব্যাপারটাও বড়ো গোলমেলে। অনিমা দাশগুপ্তের এই স্মৃতিকথাতেই আছে, শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাতটি কাটানোর পরের সকালে সে-বাড়িতে বাসনমাজার মহিলাটি আসেননি। মেজোননদ, যিনিও অনিমার স্বামী প্রেমাংশু দাশগুপ্তের মতোই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তিনি রায় দিয়েছিলেন, 'এখন যখন বাড়িতে দাসী এসেছে তখন আর ভাবনা কি? সেই বাসন মাজবে।' (পৃ. ৫৬-৫৭) অনিমার শাশুড়ির (তিনি অবশ্য কোনো পার্টির সদস্য নন।) আপত্তি ধোপে টকল

না। অনিমা তাঁর কাছে অকৃত্রিম স্নেহ পাওয়ার কথা এই স্মৃতিকথায় শতমুখে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা নিজের সন্তানদের বড়ো বেশি সমঝে চলতেন। অনিমা যখন শালপাতা আর ছাই দিয়ে বাসন মাজতে বসলেন তখন শাশুড়ি এসেছিলেন সাহায্য করতে। কিন্তু মেজোননদের তাড়ায় সেখানে দাঁড়াতে পারেননি। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২)

রুশতীকে ধন্যবাদ, অনেক আড়াল-ভাঙা এমন আত্মকথনকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। নিবিষ্ট মনোযোগে তিনি আরো লক্ষ করেন, কর্মসূত্রে জীবনসূত্রে নারীকেন্দ্রিক জিজ্ঞাসাগুলির সঙ্গে বা নারীমুক্তির বার্তার সঙ্গে যিনি যত বেশি যুক্ত, তিনি তত কম বলতে পেরেছেন নিজের কথা। আড়াল ভাঙতে না-পারাটা হয়ে উঠেছে তাঁদের মানমর্যাদার লড়াই। তুলনায়

যাঁরা নুন-পান্তার হিসেব কষতে কষতে তেমন আদর্শ-অঙ্গীকারে যুক্ত করতে পারেননি নিজেদের, ... সামাজিক সম্ভ্রমের আবর্তে অনেকটাই অপাঙ্‌ক্তেয়, নিদারুণ পোড়খাওয়া মানুষ যাঁরা, তাঁরা কি নিজের চারপাশের আড়ালটা ভেঙে ফেলতে পারেন তুলনায় সহজে? ('স্মৃতিকথায় আত্মকথায়'..., পরাণের আলো ভুবনের আঁধার, ২০১১, পৃ. ৪৫)

'জগৎমাঝে কলঙ্কিনী, পতিতা' কেতকী দত্তের 'নিজের কথায়, টুকরো লেখায়' (২০০৬) বইটিতে তা-ই হয়তো এত অনর্গল এত অকপট তিনি—

আমার টাকাটাতে কোনো খারাপ নেই, অসুবিধে নেই, কিন্তু আমি খারাপ। ও অভিনেত্রী কেতকী দত্ত-ও খারাপ! আমার টাকায় অনেকে প্রতিপালিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে।... কিন্তু আমার বিপদের দিনে, তাদের কাছে গিয়ে বললে কিন্তু তখন পাই না।

মায়ের কথা থেকে নিজের কথা, মোহন দত্ত থেকে অসীম চক্রবর্তী, সব প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি বঞ্চনা প্রতারণা হাহাকার অথচ কর্তব্য—আড়াল সরিয়ে জীবনরঙ্গমঞ্চের একেবারে সামনে এনে রেখেছেন কেতকী, আলো পড়েছে তার ওপর—পাঠক দর্শক জেনেছে তাঁর স-ব কথা। আর-এক অসাধারণ মঞ্চাভিনেত্রী মায়া ঘোষকে নিয়ে 'অসাধারণ' একটি কাজ করেছেন রুশতী সেন, 'মায়া ঘোষ : মঞ্চই জীবন' (থীমা, ২০১৩)। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন 'অভিজ্ঞ দর্শক, নাট্যবোদ্ধা এবং সম্পাদক' যেভাবে কেতকী দত্তকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন তাঁর যাপনের অনেক অনুভব আর অসহায়তা, রুশতী সেনও তাঁর নাটক দেখার অভিজ্ঞতা দিয়ে নাটক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এবং এক মানবিক সংবেদন ও অন্তরঙ্গতা দিয়ে মায়া ঘোষকে দিয়ে উন্মোচন করেছেন তাঁর মঞ্চ-জীবনের দিনপঞ্জি। মায়া ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত এ জীবনচিত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি আধুনিক বাংলা থিয়েটারের ১৯৬০ থেকে বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত অনেক কথাই যুক্ত হয়েছে, মূর্ত হয়েছে 'বাঙালি অভিনেত্রীর জীবনযন্ত্রণা ও অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস'। অনেকদিন কাজের বাইরে-থাকা 'সংবেদনশীল আর আত্মসন্ধানী মনটিকে'

বাঁচিয়ে রাখা এই শিল্পীকে এইভাবে পাঠকের কাছে এনে দেওয়ার জন্য রুশতী সেন অভিনন্দনযোগ্য—তাঁর অনুসন্ধিৎসু অন্তর্মুখিতা ও আবেগঋদ্ধতার জন্যই হয়তো মায়া ঘোষ এতটা উন্মোচিত করেছেন নিজেকে, এমনই মনে হয়।

তবে স্মৃতিকথায় আত্মকথায় যে 'আড়াল'-এর কথা হচ্ছিল, সেই সূত্রেই বলা যায়, যে-আড়ালকে কখনও 'শিল্পসম্মত, হয়তো জীবনসংগতও' মনে হয়েছে রুশতীর, তাঁর নিজের লেখা 'রোজনামচার কয়েক পাতা' (লালমাটি, ২০১৯)-তেও কি সেই 'আড়াল' সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি? তাঁকেও তো 'মাতঙ্গিনী' আর 'মন্দাকিনী'র প্রচ্ছদ ব্যবহার করতে হয়েছে একুশ শতকের প্রায় দুটি দশক পার করেও। এই না-পারাটা তাই সময়ের নয়, শিল্পের নয়, বরং অনেক বেশি জীবনের। সেটা বুঝেই যেন তিনি লিখেছিলেন—

> যাঁর আলোকপ্রাপ্তি যত বেশি, তাঁর বানিয়ে তোলার আয়োজন তত আঁটসাট।... আমরা, যারা সমাজের, সংসারের, নিজের প্রয়োজন মেটাতে বাইরে বেরই, কিন্তু ঘরোয়া থাকার বালাই যাদের ছেড়ে যায় না।... যখন ভাবি, বুঝি ভাঙছি ওই বালাইয়ের বাহানা, তখন আমরা পুরুষ হয়ে উঠতে চাই নিতান্ত অসহায় ভঙ্গিতে। সটান নারীর কোনো মৌলিক বিকল্প আমাদের নাগালে আসে না। একে সতর্কবার্তা বললে বেশি বলা হবে নিশ্চয়; আবার একান্তই কথার কথা বললে হয়তো পুরোটা বলা হবে না। ('শিক্ষিত বাঙালি মেয়ে : গতি ও প্রকৃতি', পরাণের আলো ভুবনের আঁধার, ২০১১, পৃ. ২৯)

চলচ্চিত্র ও নাটক দেখার প্রতিক্রিয়া রুশতী সেনের লেখালিখির বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে। রাজা, ডাকঘর কিংবা রক্তকরবী দেখার অভিজ্ঞতা যেমন একাধিক প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে, তেমনই সাম্প্রতিক নাটকও যেমন উইঙ্কল টুইঙ্কল-যযাতি-ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত-মাধবী কিংবা মায়ের মতো, এবং আরো কিছু নাটক তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই এসেছে গ্রুপ থিয়েটার-নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাফল্য-ব্যর্থতা প্রসাদ-বিষাদ সংগুপ্ত ঈর্ষা কিংবা আকস্মিক উচ্ছ্বাস। আবার সত্যজিতের চলচ্চিত্রের পাশাপাশি নবারুণ ভট্টাচার্যের হারবার্টও তাঁর আলোচনার বাইরে থাকেনি। এমনকি 'প্রাক্তন' দেখার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে তাঁর মনে এসেছে 'জতুগৃহ' 'ক্ষণিকের অতিথি' কিংবা 'ইজাজৎ'-এর কথা। তুলনামূলক এই বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজের দীনতা, ফাঁপা মানুষের মূল্যবোধহীনতা। আবার আদিত্যবিক্রম দাশগুপ্তের 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' তাঁকে এতই অভিভূত ও আচ্ছন্ন করেছে যে সেই মুগ্ধতা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারে তিনি উৎসুক। 'অপু থেকে পিকু' রচনাটি তাঁর সত্যজিতের নানা ছবিতে শিশু আর শৈশবের এক অনবদ্য বিশ্লেষণ। এই আলোচনায় অপু যেমন আছে, আছে কাজল, 'পরশপাথর'-এর পলটু, প্রাপ্তবয়স্ক দুই শিশু—গুপী আর বাঘা, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র টুকলু, পিকু, নির্বাক ছবি 'ট্যু'-এর দুই বালক, এমনকি 'সোনার কেল্লা'র মুকুল। এখানে রুশতী দেখেন—শৈশব থেকে শুরু করে প্রতি মুহূর্তে বাঁচবার তাগিদে লড়তে লড়তে, নিশ্চিন্দিপুর থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে মনসাপোতা, পরে কলকাতা—এসব ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত

> ছন্নছাড়া অপু তার সাবালক যন্ত্রণার নিরাময় খুঁজতে শেষ পর্যন্ত ছুটে এসেছে এক শৈশবের দুয়ারে।... অপু তাই প্রথম সুযোগেই কাজলের বন্ধু হতে চায়। এই বন্ধুত্বের দাবিতে অপু যেন সাবালক জগতের সব অন্ধকারকে দীপান্বিত করে দিল। ('অপু থেকে পিকু', ছেলে বুড়োর সত্যি মিথ্যে, ২০১০, পৃ. ১০৯)

কিন্তু যাকে 'সাদা ফুল কালো রঙ' দিয়ে আঁকতে হয়, সেই পিকু কী করবে? তার খেলনায় উপচে-পড়া ঘর, ঝক্‌ঝকে সুন্দর জামাকাপড়, এমনকি তার হাতের রঙিন ছবি, কোনোকিছুই যে তার শৈশবকে নিশ্চিত বাল্যের সংজ্ঞায় আর মেলাতে পারছে না। 'পিকু'-র দর্শক জানেন, পিকুকে বাগানে ঘুরে ফুলের ছবি আঁকতে হয়েছিল কারণ তার মা এবং হিতেশকাকু তখন তাদের আসঙ্গবাসনায় মগ্ন থাকবে ঘরে, বিছানায়। হঠাৎ বৃষ্টি এলে শুধু তার ছবির রঙ-ই ধেবড়ে যায় না, বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পায় ভিতরে মা আর হিতেশকাকুর কলহ।

> তার শিশুসুলভ বিশ্বাসের মূল্যে সব বয়স্কই যে মুনাফা লুটছে এ বোধ যেন তার কাছে আসতে শুরু করেছে। একমাত্র বন্ধু দাদুও তো আজ থেকে আর নেই। এতখানি একাকিত্ব, এতদূর অনিশ্চিতি, সাবালক বোধ-বুদ্ধির এই বোঝা নিয়েই তো পিকুকে বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের পাড় ভাঙতে হবে।... পিকুর কাহিনিতে এসে শৈশব তাই আর নিশ্চিতির প্রতীক রইল না। এই না-থাকার বাস্তবকে সুস্পষ্ট বিন্যাস দিলেন সত্যজিৎ রায়। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫)

তা-ই হয়তো চরম পরিণামে পৌঁছনোর আগে তাঁর শিল্পে তিনি বারবার শৈশবের কাছে ফিরে আসেন—কারণ শিশুর সততা আর সারল্যই পারে সাবালক জীবনের সব সংশয় আর ভ্রান্তিকে ভেঙে দিতে। 'শাখা-প্রশাখা'য় সেই বালক-ই তার দাদুকে বলেছিল, বড়োদের যাপন আর কলহ থেকে তার শ্রবণে পৌঁছেছিল সেই শব্দগুলি—'আমি এক নম্বরি জানি, দু-নম্বরি জানি'। এইভাবে কখনও ডাকঘর, কখনও পথের পাঁচালী, কখনও ভালো রাক্ষসের গল্প থেকে কাননপিসির জপমালায় পৌঁছে যেতে যেতে বর্তমানের স্বার্থপর আধুনিকতার মধ্যে অপাপবিদ্ধ শৈশবের অনিবার্যতাকে খুব প্রয়োজনীয় মনে করেন রুশতী এবং তাঁর সাবলীল গদ্যের জাদুতে পাঠকও যেন পাড়ি দেয় সেই ফেলে-আসা হারিয়ে-যাওয়া বাল্যের নিশ্চিন্দিপুরে। সমালোচক রুশতী সেনের জিত এইখানে যে সংবেদী পাঠককে তিনি এমন উড়ালের জন্য উৎকণ্ঠ করতে পারেন। তা-ই 'এলোমেলো কল্পনার কাছে' (কিছু মুহূর্ত কিছু আশ্রয়, ২০১৭) আরেকবার পৌঁছনোর জন্য পাঠককে বইয়ের সেল্‌ফ্ থেকে আরেকবার ধুলো ঝেড়ে নামাতে হয় তুতু-ভুতু-কে (ধীরেন বল, ১৯৫৯) কিংবা কাঞ্চনগড়ের কোকিলস্যার (প্রচেত গুপ্ত, ২০০৯) সংগ্রহের জন্য তৎপর হতে হয়।

রুশতী সেনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ 'কথাবার্তা-অমলেন্দু চক্রবর্তী' (সূত্রধর, ২০১২)। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯) অজাতশত্রু

ছদ্মনামে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ' বিভাগে তা মুদ্রিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সুবোধ ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র সমকাল ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে যে কথাবার্তা তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় অমলেন্দু চক্রবর্তীর দেওয়া দুটি সাক্ষাৎকার 'জাগর' পত্রিকার প্রতিনিধি এবং প্রবুদ্ধ বাগচী-কে। এক সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আর-এক সৃজনশীল ব্যক্তির কথোপকথনে বিভিন্ন বিষয় যেভাবে উঠে এসেছে তা' নিঃসন্দেহে জরুরি এবং এই কাজের মধ্যে দিয়ে সম্পাদকের সন্ধিৎসু ও বহুমুখী মনের পরিচয় পাওয়া গেল, যিনি ভাবনাকে বিভিন্ন দিকে সঞ্চার করতে অকৃপণ।

এমন একটা মন্তব্য মনে হয়, নিশ্চিতভাবেই মনে হয় রুশতী সেনকে ক্ষুব্ধই করেছে, যখন তিনি শুনেছেন 'সাহিত্য এবং অর্থনীতি তো দুটি একেবারে নিঃসম্পর্কিত বিষয়, সুতরাং অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষিকা বাংলাবিভাগে গিয়ে পড়াতে পারবেন কী করে!' মাঝে মাঝে এজন্য তিনি বিনয়ের সঙ্গেই বলেছেন, 'অর্থনীতি পড়াই আর বাংলায় হিজিবিজি লিখি!' কৈফিয়তের একটা পরিসর তৈরি হল 'আবাদের মাটি আবাদের ভাষা' প্রবন্ধে এবং লিখতে হল 'সাহিত্য এবং অর্থনীতি : পাঠের দু-চারটি সূত্র' (মানুষের কথা ফানুসের বয়ান, ২০০৭)।

> যেকোনো সাহিত্যই তার জীবনসংগতির এবং শিল্পসম্মতির তাগিদে নিত্যকার অর্থনীতির আবর্ত বাদ দিয়ে এগোতে পারে না। যতই অনর্থনৈতিক দেখাক তাকে, আসলে অর্থনীতির নিয়ম জীবনে অঙ্গাঙ্গি মিশে আছে আখ্যানের পরতে পরতে। (পৃ. ১৯)

অ্যালফ্রেড মার্শাল-এর সংক্ষিপ্ত একটি সংজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছেন প্রাবন্ধিক, 'Economics is the study of mankind in the ordinary business of life.' বলেছেন—

> মানুষের চাকরি-বেকারি, রুজি-রুজিহীনতা, বেচা-কেনা, ভোগ-ত্যাগ, আহার-অনাহার, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, সন্তোষ-অসন্তোষ, শ্রম-বিশ্রাম সবকিছুই আসে মানুষের 'ordinary business of life'-এর আওতায়, অর্থাৎ অর্থনীতির যাঁতাকল থেকে ওদের একটিরও ছাড় নেই। সুতরাং তেমন ছাড় থেকে সাহিত্যও বঞ্চিত। উপরের বেসাতির একটিও যেখানে নেই সেখানে আখ্যান এগোবে কী করে?' (পৃ. ১৭)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে রুশতী পড়েন আরণ্যক এবং মহেশ, হালদারগোষ্ঠী এবং যোগাযোগ, দুখে কেওড়া ও হাল-বেহাল; এবং সেই পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় তিনি খুলে দেন বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার একটা নতুন দিক। বাংলা কথাসাহিত্য-সমালোচনা নতুন একটা অভিমুখ পায় তাঁর কলমে, মুক্তি পায় বহু ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে-যাওয়া চরিত্র-ঘটনা আর নামকরণ বিচারের গণ্ডি থেকে। সমকালের ভূমিব্যবস্থা-অর্থনীতির সরকারি নানা পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে বাংলা গল্প-উপন্যাস পাঠে রুশতী সেনের দৃষ্টিভঙ্গি একবার উদ্ধার

করা যাক—ভগীরথ মিশ্রের 'সে ফেরেনি' কিংবা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ঢোঁড়া উপাখ্যান'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> তার অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতই জটাকে জটা, অমিতাভকে অমিতাভ বানিয়েছে।... পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির বিন্যাসে দেখছি, জোতদার যথাসম্ভব ভূমিহীন, সহায়সম্বলহীন কৃষককে ভাগচাষী হিশেবে পেতে আগ্রহী, কারণ ভাগচাষীর তরফে যুদ্ধং দেহি ভাব আদৌ বিরল নয়।... ১৯৮৭-র সমীক্ষাটিতে পাই, মুর্শিদাবাদের আমিনাবাদ মৌজায় আটের দশকে গোটা চারেক নথি আছে যে ভাগচাষী স্থানীয় কার্যালয়ে না জমা দিয়েছে জোতদারের প্রাপ্য ফসল, না মানছে অপারেশন বর্গার একটিও কানুন। আবার অতুল কোহলির বইতে এমন জোতদার পরিবারকে হামেশাই দেখা যায় যার মালিকানায় আটের দশকের গোড়ায় রয়েছে ২৭০ একর জমি। ১৫০ একর চার ছেলেমেয়ের নামে আর ১২০ একর ভগবানের নামে দেবোত্তর! অমর মিত্রের 'ডাইন' গল্পে হরি নায়েক বড় বেনিয়মের মানুষ, সে দানকে বলে বেনাম। অথচ বাড়ির মুনিষ কি জামাইয়ের নামে জমি রাখাটা ঐতিহ্যবাহী প্রথা। হরি নায়েক সেই ঐতিহ্যকে বেনামের বদনাম দিয়ে জমির দখল নিতে চায়—'... আইনকানুন... মানুন বাবুমশাইরা। বাড়তি লুকোন জমি আমাদের দিন। আমরা খেয়ে বাঁচি। অন্যের নামে জমি রেখে সেই জমির ধান নিজের খামারে তোলা সরকারী নিয়ম নয়!' (আবাদের মাটি আবাদের ভাষা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০)

এই চিন্তনেই বিশ্লেষিত হয় আইন-শৃঙ্খলা (অভিজিৎ সেন), নুনা সামাডের গল্প (অনিল ঘড়াই), বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি (রামকুমার মুখোপাধ্যায়), ফড়িং হইল পক্ষী (তপন বন্দ্যোপাধ্যায়) কিংবা আফসার আমেদের 'ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত? গল্প। আমরা দেখি, আনসারউদ্দিনকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে তাঁর স্বেচ্ছাব্রত—

> নদীয়ার নতুন ন' পাড়া গ্রামের আনসারউদ্দিনের জীবন আমরা জানি না। যেমন জানি না, তাঁর মতো অনেকেরই প্রাত্যহিক জীবনযাপন, যাঁরা নিজে হাতে নিজের পাঁচ বিঘে জমি চাষ করেন, খ্যাপলা জালে মাছ ধরেন...। তিনি গল্প লেখেন তাঁর ধানের গন্ধমাখা, মাছের স্পর্শমাখা হাতে...
>
> জীবনের যে জানাচেনা আর অনুভব আনসারউদ্দিনকে তাঁর গল্পে পৌঁছে দেয়, সেই অভিজ্ঞতায় এবং চিন্তা চেতনায় তিনি যে কতখানি বিশিষ্ট, তা যেন লেখক নিজেই পুরোটা জানেন না। ('না-পাওয়ার গল্প চাওয়ার ভাষা', সমকালের গল্প-উপন্যাস : প্রত্যাখ্যানের ভাষা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫)

লেখকের না-জানার এই ক্ষতিপূরণে পরম মমতায় এগিয়ে আসেন পাঠক-সমালোচক রুশতী সেন—নেনিনের মা, পূবালি, কবর কিংবা হাল-বেহাল-এর মতো গল্প পড়তে আগ্রহ তৈরি হয়।

নিত্য-নতুন বিষয়ে গবেষণা-উৎসুক মন, শ্রম ও নিষ্ঠা, রুচি ও রসবোধে রুশতী

নিজেই ক্রমশ যেন গড়ে তোলেন সমালোচনার এক বিশেষ অভিমুখ। বাংলা সমালোচনার ধারাবাহিকতায় মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ বা মানবীবিদ্যার তত্ত্ব-প্রয়োগ নতুন নয়, কিন্তু রুশতীর লেখালিখিতে তত্ত্বের কোলাহল নেই, আছে রসবোধের স্মিতদীপ্তি, যুক্তি প্রাখর্য এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন গদ্যের সাবলীল প্রবাহ। তাঁর পঠনপাঠনের বৈচিত্র্য ও বিস্তার—গল্প-উপন্যাস-নাটক-স্মৃতিকথা-চলচ্চিত্র এবং শিশু-কিশোর-সাহিত্যে তাঁর অবাধ ও আন্তরিক পরিক্রমা এবং পাণ্ডিত্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে তার অকৃত্রিম রসদীপ্ত উচ্চারণ লক্ষ করার মতো। অর্থনীতি আর সাহিত্য নিয়েই তাঁর 'বিন্দু বিন্দু জীবন যাপন'। আর এই যাপনের নির্যাস তাঁর সমালোচনাকে সাবেক ঘের থেকে মুক্তি দিয়েছে।